৪৭তম লিখিত বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা

বাংলাদেশ : ৩ + বিজ্ঞান : ৩

মোট সময় : ২ ঘন্টা

[দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে]

নমুনা উত্তরপত্র

বাংলাদেশ-৩ (৫০)

[১. খাতায় উত্তর লেখার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর লিখতে হবে; অন্যথায় উত্তর মূল্যায়নযোগ্য হবে না।
২. শুধু টেকনিক্যাল ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য বিজ্ঞান অংশের উত্তর লেখার প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য সময় বরাদ্দ ১ ঘন্টা]

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : **নম্বর** ৫×১০ = ৫০

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে, প্রয়োজনীয় মানচিত্র, গ্রাফ, চার্ট এবং রেফারেন্সসহ তথ্যবহুল উত্তর করলে সর্বোচ্চ ৬.৫-৭ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৩-৪, এভারেজ নম্বর ৪.৫-৫.৫।
iii. ভুল ডেটা প্রদান করলে তা কেটে সঠিক ডেটাটি লিখে দিবেন।
iv. প্রশ্নের উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।
v. প্রতিটি প্রশ্নে ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন।
vi. খাতার প্রথম বা শেষ পৃষ্ঠায় বাংলাদেশ ও বিজ্ঞানের জন্য আলাদাভাবে ৩/৪টি করে মন্তব্য লিখে দিবেন।

১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি বর্ণনা করুন।

উত্তর: ভৌগোলিক অবস্থান:

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ: বাংলাদেশ ২০° ৩৪′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬° ৩৮′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮° ০১′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯২° ৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত।

কর্কটক্রান্তি রেখা: কর্কটক্রান্তি রেখা (ট্রপিক অব ক্যান্সার) বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে।

সীমানা: পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং দক্ষিণ-পূর্বে ত্রিপুরা ও মিয়ানমার।উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়।দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

আয়তন: বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।

মোট সীমান্ত: বাংলাদেশের মোট স্থল সীমান্তের অধিকাংশই ভারতের সাথে এবং সামান্য অংশ মিয়ানমারের সাথে রয়েছে। বাংলাদেশের মোট সীমানা ৪,৭১২ কিমি. (ভারতের সঙ্গে ৩৭১৫.১৮ কিমি.; মিয়ানমারের সঙ্গে ২৮০ কিমি. এবং সমুদ্র উপকূল ৭১৬ কিমি.), এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থলসীমা ৩,৯৯৫ কিমি.। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৬ কিলোমিটার এবং মহীসোপান ৩৫০ নটিক্যাল মাইল বা (৬৪৮.২ কিলোমিটার)।

ভূপ্রকৃতি (Physiography) : ভূপ্রকৃতির ভিন্নতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা–

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড় ২. প্লাইস্টোসিনকালের সোপান ৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

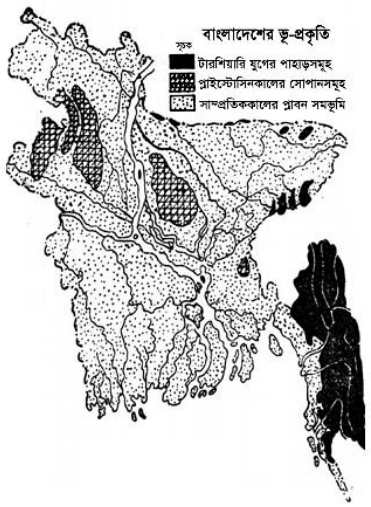

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ (Tertiary Hills):

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলো দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলো আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলো বাংলাদেশের মোট ভূমির ১২ শতাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়– ১. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়, ২. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়।

* দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল: রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের পূর্বাংশের পাহাড়গুলো এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার পাহাড়গুলো তুলনামূলকভাবে বেশি উঁচু। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ের গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার।

* উত্তর-পূর্বাঞ্চল: উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণে অবস্থিত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা সর্বোচ্চ ২৪৪ মিটার।

২. **প্লাইস্টোসিন যুগের সোপানসমূহ (Pleistocene Terraces):**

আনুমানিক ২৫,০০০ বছর আগের সময় হলো প্লাইস্টোসিনকাল। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। রাজশাহী অঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি, গাজীপুরের মধুপুর ও ভাওয়ালগড় এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় প্লাইস্টোসিনকালে গঠিত। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানগুলো বাংলাদেশের মোট ভূমির ৮ শতাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত।

বরেন্দ্রভূমি : বরেন্দ্রভূমি অবস্থিত দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। বরেন্দ্র এলাকার মাটির রং ধূসর ও লাল বর্ণের। প্লাবন সমভূমি থেকে বরেন্দ্র এলাকার উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। বরেন্দ্র এলাকার আয়তন প্রায় ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার।

মধুপুর ও ভাওয়াল গড় : স্থানীয়ভাবে গজারি বন নামে পরিচিত । মধুপুরের গড় অবস্থিত টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় এবং ভাওয়ালের গড় অবস্থিত গাজীপুর জেলায়। মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এলাকার আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। সমভূমি থেকে মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ের উচ্চতা ৩০ মিটার।

লালমাই পাহাড় : লালমাই পাহাড়ের আয়তন ৩৪ বর্গকিলোমিটার (১৩ বর্গমাইল)। লালমাই পাহাড়ের গড় উচ্চতা ২১ মিটার। লালমাই পাহাড় এলাকার মাটির রং লালচে; নুড়ি, বালি ও কংকর মিশ্রিত। লালমাই পাহাড়ের অবস্থান কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি :

৩. সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি (Recent Floodplains):

* দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই এই প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভুক্ত, যা দেশের মোট ভূমির প্রায় ৮০%।

* গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) এবং মেঘনা নদীর পলি দ্বারা গঠিত এই সমভূমি অত্যন্ত উর্বর এবং নিচু।

* এ অঞ্চলে অসংখ্য নদী, উপনদী ও খাল-বিল ছড়িয়ে আছে, যা একে বিশ্বের বৃহত্তম নদী-ব-দ্বীপ অঞ্চলগুলোর একটি করে তুলেছে।

* বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন অবস্থিত, যা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা ব-দ্বীপের একটি অংশ।বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি প্রধানত নদী ও পলিগঠিত হওয়ায়, এটি প্রতি বছর মৌসুমি বন্যা এবং নদীর ভাঙ্গনের ঝুঁকিতে থাকে।

* সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্গত ভূমিরূপ পাদদেশীয় সমভূমি, বন্যাপ্লাবন সমভূমি, বদ্বীপ সমভূমি, উপকূলীয় সমভূমি, স্রোতজ সমভূমি ইত্যাদি।

২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলতে কাদের বোঝায়? বাংলাদেশের যে কোন দুইটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরুন। তাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি কী কী?

উত্তর : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলতে এমন সব জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে ছোট, নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক, ধর্মবিশ্বাস, ও জীবনধারায় প্রধান জনগোষ্ঠী (বাঙালি)-এর থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তারা সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে এবং নিজস্ব সামাজিক কাঠামো ও ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা বজায় রেখেছে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এদেরকে "উপজাতি", "ক্ষুদ্র জাতিসত্তা", "নৃগোষ্ঠী" বা "সম্প্রদায়" বলে অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্র তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাষা রক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করেছে (সংবিধানের ২৩(ক) অনুচ্ছেদ)।

নিচে বাংলাদেশের দুটি পরিচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী — চাকমা ও মণিপুরী — জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

(১) চাকমা জনগোষ্ঠী

বসবাস: চাকমারা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলাতেই (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) বসবাস করে। সংখ্যার দিক থেকে এরা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী।

উৎপত্তি: তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হলো — চাকমারা মূলত মধ্য মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চল থেকে আগত। ইতিহাসবিদদের মতে, প্রায় পাঁচশ বছর আগে তারা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

জীবনধারা: চাকমারা পাহাড়ের ঢালে ও উপত্যকায় বসবাস করে। ঐতিহ্যবাহী বাঁশ-কাঠের তৈরি উঁচু ঘরে (চাংঘর) তারা বসবাস করে, যা বর্ষাকালে নিরাপদ। প্রধান পেশা কৃষিকাজ, বিশেষ করে জুম চাষ (Slash and burn cultivation) তাদের ঐতিহ্যবাহী কৃষি পদ্ধতি। খাদ্যাভ্যাসে চাল, শাকসবজি, মাছ, বাঁশকোরল, শুকনো মাছ ও পাহাড়ি ফলমূল প্রধান।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য: চাকমারা নিজেদের ভাষায় কথা বলে, যাকে চাকমা ভাষা বলা হয় (লিপি "অজহা লিপি")। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রধানত বৌদ্ধধর্মভিত্তিক, তবে লোকাচার ও প্রকৃতিপূজার প্রভাবও রয়েছে। বৈসাবি উৎসব (বৈশাখ, সাংগ্রাই, বিষু) চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের যৌথ নববর্ষ উৎসব, যা আনন্দ, নাচ-গান ও পানির খেলায় ভরপুর। নারীরা পরিধান করে থামিন ও হাদি, পুরুষরা ধুতি ও জামা। চাকমা লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য ও বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত তাদের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

(২) মণিপুরী জনগোষ্ঠী

বসবাস: মণিপুরীরা প্রধানত সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ময়মনসিংহের দুর্গাপুর অঞ্চলে বাস করে।

উৎপত্তি: অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বার্মা-মণিপুর যুদ্ধ (১৮১৯–১৮২৫) ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারতের মণিপুর রাজ্যের অধিবাসীরা পূর্ব বাংলায় এসে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে।

জীবনধারা: মণিপুরীরা সাধারণত সমতল অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের মূল পেশা কৃষিকাজ, তাঁত বয়ন, নাচ-গান ও সাংস্কৃতিক চর্চা। নারীরা বয়নশিল্পে দক্ষ, তাদের তৈরি রঙিন তাঁতের শাড়ি ও কাপড় বাংলাদেশের ঐতিহ্যে বিশেষ স্থান দখল করেছে।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য: মণিপুরীরা তিন ভাগে বিভক্ত — বিষ্ণুপ্রিয়া, মৈতৈ, ও পাঙন। বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈরা হিন্দু, আর পাঙনরা মুসলমান। তাদের ভাষা দুটি — বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও মৈতৈ। বিশ্ববিখ্যাত মণিপুরী নৃত্য তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম প্রতীক। প্রধান উৎসব হলো রাসপূর্ণিমা, যেখানে কৃষ্ণলীলার নৃত্যাভিনয় পরিবেশিত হয়। এছাড়া বিষু, চৈরাউবা, কাঙ উৎসব, দোলযাত্রা ও হোলি উৎসবও ব্যাপক উৎসাহে পালিত হয়।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো দেশের সমাজ-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও তারা নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যা তাদের উন্নয়ন ও জীবনমানের পথে বড় বাধা সৃষ্টি করছে। প্রধান সমস্যাগুলো হলো—

১. ভূমি অধিকার ও পুনর্বাসন সমস্যা: পার্বত্য অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষের জমি দখল ও ভূমি বিরোধ আজও চলমান। অনেক পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়ে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই করছে।

২. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার অভাব: দুর্গম এলাকায় বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা খুব কম। মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার অভাবে শিশুরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। চিকিৎসাসেবা থেকেও তারা বঞ্চিত।

৩. অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা: চাকরির সুযোগ সীমিত এবং কৃষি বা হস্তশিল্পের উপর নির্ভরতা বেশি। আধুনিক প্রযুক্তি ও বাজারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে না পারায় তারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে।

৪. সংস্কৃতি ও ভাষার বিলুপ্তি: আধুনিকতা ও মূলধারার সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলে অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, পোশাক ও ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলে যাচ্ছে।

৫. সামাজিক বৈষম্য ও অবহেলা: মূলধারার সমাজে এখনো অনেক সময় তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা যায়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণও সীমিত।

৬. নারী ও শিশুদের দুর্বল অবস্থা: অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। শিশুরা অপুষ্টি ও বিদ্যালয়বিমুখতার শিকার।

সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাষ্ট্র ও সমাজের সমন্বিত প্রচেষ্টাই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।

৩. 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের উন্নয়নে এই সুবিধা কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, তা বর্ণনা করুন এবং এর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করুন।

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যাকে আর কেবল বোঝা নয়, বরং উন্নয়নের অন্যতম সম্পদ হিসেবে দেখা হয়। একটি দেশের জনসংখ্যার গঠন ও গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ। বাংলাদেশ আজ এমন এক সময়ে রয়েছে, যখন এর মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কর্মক্ষম বয়সে প্রবেশ করেছে। এই সময়টিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে।

জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, যখন কোনো দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর (১৫–৬৪ বছর বয়সী) সংখ্যা নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী (০–১৪ ও ৬৫ ঊর্ধ্ব বয়সী) অপেক্ষা বেশি হয়, তখনই তাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বলা হয়। এই সময়ে শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন বাড়ে, আয় বৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের সুযোগ তৈরি হয় — ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৬৫–৬৮% মানুষ কর্মক্ষম বয়সের মধ্যে রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশটি ২০১২ সাল থেকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড যুগে প্রবেশ করেছে এবং এই সুযোগ ২০৪০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এখন "স্বর্ণযুগে" রয়েছে। বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদে পরিণত হতে পারে। এ তরুণরা শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারলে অর্থনীতিতে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।
প্রধান ইতিবাচক দিকগুলো হলো:
* শ্রমশক্তির বৃদ্ধি: তরুণ জনগোষ্ঠী কৃষি, শিল্প, সেবা ও প্রযুক্তিখাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে।
* অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত: দক্ষ শ্রমশক্তি বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বাড়লে জাতীয় আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি সম্ভব।
* রেমিট্যান্স ও বিদেশে কর্মসংস্থান: বিদেশে দক্ষ শ্রমিক রপ্তানির মাধ্যমে রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।
* উদ্যোক্তা সৃষ্টি: তরুণদের উদ্যোক্তা মনোভাব ও স্টার্টআপ সংস্কৃতি অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে।
বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ : যদিও বাংলাদেশ জনমিতিক সুবিধা পাচ্ছে, কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা এ সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে—
* দক্ষতার অভাব: শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো তাত্ত্বিক, কর্মমুখী নয়। ফলে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বড় অংশ দক্ষতার ঘাটতিতে ভুগছে।
* বেকারত্ব: প্রতিবছর প্রায় ১৫–১৮ লাখ তরুণ কর্মবাজারে প্রবেশ করলেও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না।
* নারীর অংশগ্রহণ কম: শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ এখনো আশানুরূপ নয়। এতে মোট উৎপাদন সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে।
* স্বাস্থ্য ও মানসিক সক্ষমতার অবনতি: প্রযুক্তির অপব্যবহার, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও স্বাস্থ্যসচেতনতার অভাবে তরুণদের কর্মক্ষমতা কমছে।
* নীতিনির্ধারণে দুর্বলতা: দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন নীতির অভাবে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের পূর্ণ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।
করণীয় ও সম্ভাবনার দিকনির্দেশনা : এই সুযোগকে সফলভাবে কাজে লাগাতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা জরুরি—
* কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা সম্প্রসারণ: শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী ও শিল্পখাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
* নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ সৃষ্টি: স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে।
* নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত: নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
* উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ সহায়তা: ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তরুণ উদ্ভাবকদের জন্য সহজ ঋণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা দিতে হবে।
* স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি: মানসিক স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে তরুণদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
বাংলাদেশের জনসংখ্যাগত অবস্থা আজ এক ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দিয়েছে। এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড সময়কাল দীর্ঘস্থায়ী নয়; এটি প্রায় ২০৩৫–২০৪০ সাল পর্যন্ত টিকে থাকবে। এখনই যদি সঠিক পরিকল্পনা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যায়, তবে তরুণরাই হবে উন্নত বাংলাদেশের মূল চালিকা শক্তি। কিন্তু যদি এই সুযোগ হারানো হয়, তবে তা দেশের জন্য অভিশাপে পরিণত হবে। তাই প্রয়োজন দূরদর্শী নীতি, কার্যকর বাস্তবায়ন ও সৎ নেতৃত্ব—যার মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে তার জনমিতিক লভ্যাংশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত করতে পারবে।

৪. বিগত সরকারের আমলে দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাব কীভাবে দেশের প্রবৃদ্ধি ব্যাহত করেছে? জ্বালানি ও ব্যাংকিং খাতে এর অর্থনৈতিক ক্ষতি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর: অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত ভিত্তি হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন। কিন্তু যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতি ও রাজনৈতিক স্বজনপ্রীতিতে জর্জরিত হয়, তখন উন্নয়ন হয় কাগজে, বাস্তবে নয়। গত দেড় দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে চমকপ্রদ প্রবৃদ্ধির দাবি করা হয়েছে, তার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে জ্বালানি ও ব্যাংকিং খাতে বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম ও লুণ্ঠনের ভয়াবহ চিত্র। এই দুই খাতের দুর্নীতি আজ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে গভীর সংকটে ফেলেছে।

□ অর্থনৈতিক দুর্নীতির সামগ্রিক চিত্র : বিগত সরকারের সময়ে অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে দায়বদ্ধতার অভাব ও ক্ষমতার একচেটিয়া ব্যবহার ছিল স্পষ্ট। সরকারি টেন্ডার, প্রকল্প, ব্যাংক ঋণ বিতরণ থেকে শুরু করে জ্বালানি ক্রয়—সবখানেই গড়ে ওঠে একটি স্বজনপ্রীতিনির্ভর অর্থনৈতিক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী সরকারি আশীর্বাদে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প পেয়েছে, যেখানে প্রকৃত উন্নয়ন নয়, বরং কমিশন বাণিজ্যই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

□ ব্যাংকিং খাতের সংকট ও অনিয়ম : বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এখন অর্থনীতির সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে।

* ঋণখেলাপির মহামারি: রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করেনি। ঘোষিত ও অঘোষিত খেলাপি ঋণের পরিমাণ এখন দেড় লাখ কোটি টাকারও বেশি।
* রাজনৈতিক প্রভাব ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুর্বলতা: ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদে রাজনৈতিক নিয়োগ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সীমিত স্বাধীনতা, ও দুর্বল নজরদারি ব্যাংক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়েছে।
* জনআস্থা ও আমানত সংকট: বহু ব্যাংক বর্তমানে তারল্য সংকটে ভুগছে। সাধারণ আমানতকারী ও প্রবাসীরা টাকা তুলে নিতে ভয় পাচ্ছে।
* অর্থপাচার ও হুন্ডি প্রবণতা: বৈদেশিক মুদ্রা পাচার এখন ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে, ফলে দেশে ডলার সংকট ও মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ব্যাংকিং খাত থেকে সৃষ্ট আর্থিক অস্থিরতা সরাসরি দেশের বিনিয়োগ, শিল্প উৎপাদন ও বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

□ জ্বালানি খাতে দুর্নীতি ও অদক্ষতা : জ্বালানি খাত গত এক দশকে সরকারের সবচেয়ে বিতর্কিত ক্ষেত্রগুলোর একটি।

* অতিরিক্ত মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় ও ক্ষতিপূরণ: সরকার "কুইক রেন্টাল" ও "ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (IPP)" নামের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করেছে, যার অনেকটাই ব্যবহার হয়নি। অথচ ব্যবহৃত না হলেও তাদের "ক্যাপাসিটি চার্জ" নামে হাজার কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে।
* গ্যাস ও কয়লা খাতের অনিয়ম: অনুসন্ধান, আমদানি ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি ও অদক্ষতা দেখা গেছে। ফলে জ্বালানি আমদানিনির্ভরতা বেড়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ পড়েছে।
* বিদ্যুৎ উৎপাদনের অকার্যকরতা: বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা থাকলেও সঞ্চালন ও বিতরণ অব্যবস্থার কারণে জনগণ "লোডশেডিং"-এর যন্ত্রণায় ভুগছে।
* স্বজনপ্রীতি ও কমিশন বাণিজ্য: সরকারি চুক্তি ও দরপত্রে রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ কিছু কোম্পানি একচেটিয়া সুবিধা পেয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়ে পরিণত হয়েছে।

□ অর্থনৈতিক প্রভাব ও জনজীবনে প্রতিক্রিয়া : জ্বালানি ও ব্যাংকিং খাতের এই দুর্নীতি সরাসরি জাতীয় অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধি শিল্পখাতে উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়েছে, ফলে পণ্যমূল্য বেড়েছে। ব্যাংক খাতের অনিয়ম বিনিয়োগকারীর আস্থা কমিয়েছে। বিদেশি মুদ্রার ঘাটতি আমদানি ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি চরম সংকটে পড়েছে।

□ নীতিগত দুর্বলতা ও দায়বদ্ধতার অভাব : এই দুর্নীতি ও অস্থিরতার মূল কারণ হলো প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাব, দুর্নীতি দমন কমিশনের অকার্যকারিতা, এবং অর্থনৈতিক নীতির কেন্দ্রীকরণ। বড় প্রকল্পের ব্যয় বেড়েছে, কিন্তু বাস্তব সুফল পাওয়া যায়নি। সরকারের তথাকথিত "উন্নয়ন প্রচারণা" বাস্তবে জনগণের অর্থ লুটের আড়াল হিসেবে কাজ করেছে।

□ করণীয় : বাংলাদেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল ও টেকসই করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ জরুরি—

* ব্যাংকিং খাতের সংস্কার: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা নিশ্চিত, খেলাপি ঋণের কঠোর আদায়, ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসন গঠন।
* জ্বালানি খাতে স্বচ্ছতা: সব চুক্তি প্রকাশ্য করা, ক্যাপাসিটি চার্জ বাতিল, এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
* দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যকারিতা: দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের বিচারের আওতায় আনা।
* জনঅংশগ্রহণমূলক নীতি গ্রহণ: অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের মতামত অন্তর্ভুক্ত করা।

জ্বালানি ও ব্যাংকিং—এই দুই খাত একটি দেশের অর্থনীতির রক্তধারা ও শক্তির উৎস। কিন্তু বিগত সরকারের দুর্নীতি, অপব্যবহার ও রাজনৈতিক স্বজনপ্রীতি এই দুই খাতকেই পঙ্গু করে দিয়েছে। ফলে আজ দেশের অর্থনীতি আস্থাহীনতা, মুদ্রাসঙ্কট ও বৈষম্যের জালে বন্দি। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শাসনব্যবস্থার সংস্কার। তবেই বাংলাদেশ আবারও প্রকৃত অর্থে জনগণনির্ভর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারবে।

৫. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মূল স্রোতসমূহ চিহ্নিত করে বাণিজ্য ভারসাম্য সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে এক বহুমাত্রিক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। বিশেষত ব্যাংকিং ও জ্বালানি খাত দুটি আজ গভীর দুরবস্থায় পড়েছে, যা রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জনগণের জীবনমানের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ গত এক দশকে প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রশংসিত হলেও, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণে এই অগ্রযাত্রা আজ বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়েছে। ব্যাংকিং খাতে ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ এবং জ্বালানি খাতে অদক্ষতা ও অপচয়—এই দুই খাতের দুরবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃত চিত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

ব্যাংকিং খাতের সংকট : বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এক সময় স্থিতিশীল ও শক্তিশালী ভাবা হলেও বর্তমানে এটি সবচেয়ে দুর্বল আর্থিক খাত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৫ সালের মার্চের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের

পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪.২০ লাখ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ৯.৫৭ শতাংশ। জাতীয়কৃত ব্যাংকগুলোতে এই হার আরও ভয়াবহ—প্রায় ৪০.৩৫ শতাংশ। এই বিশাল পরিমাণ খেলাপি ঋণ মূলত রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি, ঋণ অনুমোদনে স্বজনপ্রীতি, এবং দুর্বল নজরদারি ব্যবস্থার ফলাফল। অনেক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ না করেও নতুন ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন। ফলে ব্যাংকগুলোতে আমানতকারীদের আস্থা কমে যাচ্ছে, আর ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা সহজে ঋণ পাচ্ছেন না।

* ব্যাংক খাতের দুর্নীতি ও প্রভাব : খেলাপি ঋণের পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতে দেখা দিয়েছে অনিয়ম ও অর্থপাচারের প্রবণতা। আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (GFI)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অর্থপাচারের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮.৩ বিলিয়ন ডলার, যার বড় অংশ ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংঘটিত। এ ছাড়াও, বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকে পরিচালনা পর্ষদের রাজনৈতিক প্রভাব, আত্মীয়স্বজন দ্বারা নিয়োগ, এবং অভ্যন্তরীণ দুর্ব্যবস্থা সাধারণ জনগণের ব্যাংকিং সেবার মানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর ফলে দেশের আর্থিক খাতে আস্থা সংকট তৈরি হয়েছে, যা বিনিয়োগ কমিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

* জ্বালানি খাতের বর্তমান চিত্র : জ্বালানি খাতেও পরিস্থিতি প্রায় একই রকম সংকটাপন্ন। ২০০৯ সাল থেকে বিদ্যুৎ সংকট মোকাবিলায় সরকার ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (rental and quick rental power plants) চালু করে। প্রথমে এগুলো অস্থায়ী সমাধান হিসেবে প্রশংসিত হলেও পরবর্তীতে তা রূপ নেয় এক দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক বোঝায়। ২০২৫ সাল পর্যন্ত সরকার স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে (IPP) প্রায় ১,০৪০ বিলিয়ন টাকা বা ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা 'ক্যাপাসিটি চার্জ' হিসেবে প্রদান করেছে—যার বড় অংশ এমন কেন্দ্রগুলোকে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো কখনো বিদ্যুৎ উৎপাদনই করেনি। ২০২১-২২ অর্থবছরে জ্বালানি খাতে ব্যয় হয়েছিল ৭১,৬৮৪ কোটি টাকা, যা ২০১৯-২০ সালের তুলনায় প্রায় ৭৫ শতাংশ বেশি। জ্বালানি তেল আমদানিতে ব্যয় বেড়েছে ৩০ শতাংশেরও বেশি, ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

* জ্বালানি খাতের অপচয় ও দুর্নীতি : জ্বালানি খাতের এই অদক্ষতা ও দুর্নীতি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বহুমুখী প্রভাব ফেলছে। ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে দুর্নীতির মাধ্যমে অনেক রাজনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছে। অকার্যকর প্রকল্প, অনুৎপাদনশীল কেন্দ্র, এবং বিদ্যুতের অতিরিক্ত দামের ফলে জনগণের বিদ্যুৎ বিল ক্রমাগত বেড়েছে। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যা কর্মসংস্থান হ্রাস ও রপ্তানি আয় কমিয়ে দিয়েছে। জ্বালানি আমদানি খাতে অতিরিক্ত নির্ভরতা মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটাচ্ছে, যা মুদ্রাস্ফীতিকে আরও তীব্র করছে।

* আর্থ-সামাজিক প্রভাব : ব্যাংকিং ও জ্বালানি খাতের এই দুই সংকট মিলিতভাবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় গভীর প্রভাব ফেলছে। ব্যাংক খাতের দুর্নীতির কারণে শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে, ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, জ্বালানি খাতে ব্যর্থতার কারণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে ব্যয়বহুল করে তুলছে।

এই সংকটের কারণে বৈষম্য বেড়েছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়ছে, এবং সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাধান ও সুপারিশ : এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে প্রয়োজন কাঠামোগত সংস্কার ও জবাবদিহিমূলক নীতি।

প্রথমত, ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধারে কঠোর আইন প্রয়োগ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে আর্থিক খাতের নীতিনির্ধারণে স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, জ্বালানি খাতে নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে দীর্ঘমেয়াদে আমদানিনির্ভরতা কমে।

পাশাপাশি, ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল করে টেকসই জ্বালানি অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও জ্বালানি খাত দেশের অর্থনীতির দুটি মৌলিক স্তম্ভ। কিন্তু এই দুই খাতেই বর্তমানে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অদক্ষতা বেড়ে যাওয়ায় সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্র যদি এখনই কঠোর সংস্কার ও জবাবদিহিমূলক নীতি গ্রহণ না করে, তবে ভবিষ্যতে এই সংকট আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। সুশাসন, স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা ভিত্তিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নই পারে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও জ্বালানি খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং দেশকে একটি টেকসই অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিতে।

বিজ্ঞান : ৩ (কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি ৩৫)

[খাতায় উত্তর লেখার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর লিখতে হবে; অন্যথায় উত্তর মূল্যায়নযোগ্য হবে না।]

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : **নম্বর**

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

ii. প্রশ্নের উত্তরে মূল বিষয়টি তুলে ধরে উদাহরণ ও চিত্রসহ (ক্ষেত্রবিশেষে) লিখলে ফুল মার্কস দিবেন প্লিজ।

iii. উদাহরণ ও চিত্র ছাড়া মূল বিষয়টি তুলে ধরলে ৫০% নম্বর দিতে পারেন।

iv. প্রশ্নের উত্তরে মূল বিষয়টি উঠে না আসলে শুন্য দিবেন।
iv. প্রশ্নের উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।
v. প্রতিটি প্রশ্নে ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন।
vi. খাতা মূল্যায়ন শেষে খাতার দ্বিতীয় বা শেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞান অংশের জন্য আলাদাভাবে ৪/৫টি মন্তব্য লিখে দিবেন প্লিজ।

১. ক. কম্পিউটারের ALU-এর মূল কাজ কী? ২.৫

উত্তর : **ALU = Arithmetic and Logic Unit** অর্থাৎ এটি গাণিতিক (Arithmetic) এবং যৌক্তিক (Logic) উভয় ধরণের কাজ সম্পাদন করে।

ALU-এর মূল কাজসমূহ

১. গাণিতিক কাজ (Arithmetic Operations):

- যোগ (Addition)
- বিয়োগ (Subtraction)
- গুণ (Multiplication)
- ভাগ (Division)

উদাহরণ: যদি CPU-কে ২৫ + ১৫ = ? নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে ALU এই গাণিতিক কাজটি সম্পন্ন করে ৪০ ফলাফল প্রদান করে।

২. যৌক্তিক কাজ (Logical Operations):

- তুলনা করা (Comparisons): যেমন, >, <, =
- AND, OR, NOT ইত্যাদি লজিক্যাল অপারেশন সম্পাদন করা।
- দুটি সংখ্যার মধ্যে কোনটি বড়, ছোট বা সমান তা নির্ধারণ করা।

৩. ডেটা স্থানান্তর ও নিয়ন্ত্রণ (Data Transfer & Control):

ALU রেজিস্টারের মাধ্যমে ডেটা গ্রহণ ও প্রেরণ করে এবং CPU-কে নির্দেশ দেয় কোন ফলাফল কোথায় সংরক্ষণ করতে হবে।

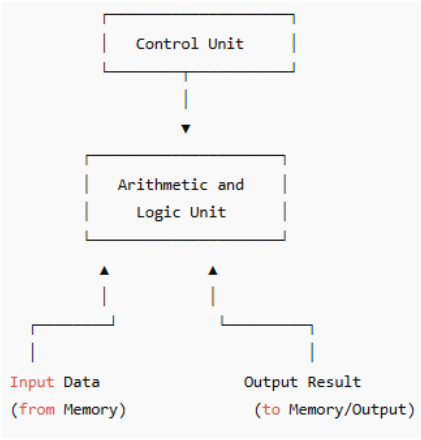

খ. উদাহরণসহ সিস্টেম সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ২.৫

উত্তর : কম্পিউটার সফটওয়্যার হলো এমন সব প্রোগ্রামের সমষ্টি যা কম্পিউটারকে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে। সফটওয়্যার প্রধানত দুই প্রকার — সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। সিস্টেম সফটওয়্যার হলো সেই সফটওয়্যার যা কম্পিউটার হার্ডওয়্যারকে পরিচালনা করে এবং অন্য সফটওয়্যার চালানোর পরিবেশ তৈরি করে।
অন্যদিকে, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হলো ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য তৈরি প্রোগ্রাম। এদের কাজ, ব্যবহার ও উদ্দেশ্যের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

বিষয়	সিস্টেম সফটওয়্যার	অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার
কাজ	হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ ও সিস্টেম পরিচালনা	নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন
ব্যবহারকারী	সিস্টেম দ্বারা ব্যবহৃত	ব্যবহারকারীর দ্বারা ব্যবহৃত
নির্ভরতা	স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে	সিস্টেম সফটওয়্যারের ওপর নির্ভরশীল
উদাহরণ	Windows, Linux, macOS	MS Word, Excel, Photoshop

গ. BIOS কী? Computer-এ BIOS-এর কাজ বর্ণনা করুন। ২.৫

উত্তর : BIOS হলো Basic Input/Output System, যা একটি কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের চিপে সংরক্ষিত ফার্মওয়্যার (Firmware)। এটি হলো কম্পিউটারের সবচেয়ে মৌলিক সফটওয়্যার, যা হার্ডওয়্যারকে সফটওয়্যারের (অপারেটিং সিস্টেম) সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম করে। BIOS-এর প্রধান কাজগুলো হলো কম্পিউটারকে সফলভাবে চালু (Boot) করা এবং অপারেটিং সিস্টেম (OS) লোড করার জন্য প্রাথমিক পরিবেশ তৈরি করা।
POST (Power-On Self Test) : কম্পিউটার চালু হওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ঠিক আছে কি না, তা পরীক্ষা করা।

হার্ডওয়্যার চিহ্নিতকরণ ও ইনিশিয়ালাইজেশন : সিপিইউ, র‍্যাম, ডিস্ক ড্রাইভ ইত্যাদিকে সনাক্ত ও সক্রিয় করে তাদের জন্য প্রাথমিক সেটিংস লোড করা।

বুটস্ট্র্যাপ লোডার লোড করা: ডিস্ক ড্রাইভ থেকে অপারেটিং সিস্টেম (OS) খুঁজে বের করে সেটিকে মেমরিতে লোড করার জন্য প্রাথমিক প্রোগ্রামটি চালু করা।

CMOS/UEFI সেটিংস সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ : সিস্টেমের তারিখ, সময় এবং বুট অর্ডার (Boot Order) এর মতো মৌলিক কনফিগারেশনগুলো সংরক্ষণ ও পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়া।

BIOS কার্যপ্রণালীর সরল চিত্র

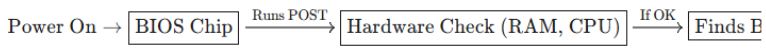

ঘ. মেলওয়্যার কী? কম্পিউটার ভাইরাস ও মেলওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ২.৫

উত্তর : মেলওয়্যার (Malware) শব্দটি হলো Malicious Software-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি এক ধরনের ক্ষতিকারক সফটওয়্যার, যা কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা ডিভাইসের ক্ষতি সাধন করার, তথ্য চুরি করার, গুপ্তচরবৃত্তি চালানোর বা সিস্টেমের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়।

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	মেলওয়্যার (Malware)	কম্পিউটার ভাইরাস (Computer Virus)
১. সংজ্ঞা	এটি হলো ক্ষতিকারক সফটওয়্যারের একটি সাধারণ ও বিস্তৃত পরিভাষা। এটি যেকোনো ধরনের ক্ষতিকারক প্রোগ্রামকে বোঝায়।	এটি হলো এক বিশেষ ধরনের মেলওয়্যার, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অন্য প্রোগ্রাম বা ফাইলের সাথে নিজেকে যুক্ত করা।
২. স্ব-প্রতিলিপি	স্ব-প্রতিলিপি তৈরি করার ক্ষমতা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। যেমন: ট্রোজান হর্স নিজে নিজে ছড়ায় না।	এটি নিজেকে প্রতিলিপি (Self-Replicate) তৈরি করতে এবং অন্য ফাইলকে সংক্রমিত করতে ব্যবহারকারীর হস্তক্ষেপ (যেমন: সংক্রমিত ফাইলটি খোলা) প্রয়োজন হয়।
৩.ছড়ানোর পদ্ধতি	ব্যবহারকারীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই ছড়াতে পারে (যেমন: ওয়ার্ম) অথবা ছড়ানোর জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে (যেমন: ট্রোজান)।	ছড়ানোর জন্য একটি হোস্ট ফাইল বা প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় এবং সাধারণত ব্যবহারকারী সেটিকে চালু করার পরই এটি সক্রিয় হয় ও ছড়ায়।
৪. উদ্দেশ্য	অত্যন্ত বিস্তৃত উদ্দেশ্য থাকে। যেমন: ডেটা চুরি করা (স্পাইওয়্যার), ফাইল এনক্রিপ্ট করে মুক্তিপণ চাওয়া (র‍্যানসমওয়্যার), বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা (অ্যাডওয়্যার) ইত্যাদি।	সাধারণত হোস্ট ফাইল বা সিস্টেমকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করা এবং অন্যান্য ফাইলকে সংক্রমিত করাই এর মূল লক্ষ্য।

ঙ. TCP/IP suit-এর যে-কোনো দুটি প্রটোকলের নাম এবং এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। ২.৫

উত্তর : TCP/IP সুইট (TCP/IP Suite) হলো ইন্টারনেট এবং অন্যান্য কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত প্রটোকলের একটি সংগ্রহ বা সেট। এই স্যুটের অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রটোকল নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. টিসিপি (TCP) - Transmission Control Protocol : স্তর (Layer): ট্রান্সপোর্ট লেয়ার (Transport Layer)।

TCP হলো একটি সংযোগ-ভিত্তিক (Connection-Oriented) এবং নির্ভরযোগ্য (Reliable) প্রটোকল। এর মূল কাজ হলো নিশ্চিত করা যে ডেটা সঠিক ক্রমে এবং ত্রুটিমুক্তভাবে উৎস থেকে গন্তব্যে পৌঁছেছে। ডেটা স্থানান্তরের আগে TCP প্রাপক এবং প্রেরক ডিভাইসের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করে (Three-way Handshake)। এটি প্রেরিত ডেটাকে ছোট ছোট অংশে (Segments) বিভক্ত করে, প্রতিটি অংশকে সিকোয়েন্স নম্বর দেয় এবং রিসিভারের কাছ থেকে Acknowledgment (স্বীকৃতি) না পাওয়া পর্যন্ত সেগমেন্টগুলো পুনরায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে। যেসব অ্যাপ্লিকেশনে ডেটার নির্ভুলতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (যেমন: ওয়েব ব্রাউজিং, ইমেইল, ফাইল ট্রান্সফার), সেখানে TCP ব্যবহার করা হয়।

২. আইপি (IP) - Internet Protocol : স্তর (Layer): ইন্টারনেট লেয়ার (Internet Layer)

IP হলো একটি সংযোগ-বিহীন (Connectionless) প্রটোকল। এটি প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে আগে থেকে কোনো সংযোগ স্থাপন করে না। এর মূল কাজ হলো ডেটা প্যাকেজগুলোকে (Datagrams) একটি নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে রুট (Route) করা বা পথ দেখানো। IP প্রতিটি ডিভাইসকে একটি ইউনিক আইপি অ্যাড্রেস (Unique IP Address) দিয়ে চিহ্নিত করে, যা ডেটা প্যাকেজগুলোর উৎস এবং গন্তব্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। IP শুধুমাত্র ডেটা প্যাকেজকে গন্তব্যের দিকে ঠেলে দেয়, কিন্তু এটি ডেটার সঠিক ডেলিভারি বা সিকোয়েন্সের গ্যারান্টি দেয় না (এই কাজ TCP করে)। বর্তমানে এর দুটি সংস্করণ প্রচলিত: IPv4 (যা ৩২-বিট অ্যাড্রেসিং ব্যবহার করে) এবং IPv6 (যা ১২৮-বিট অ্যাড্রেসিং ব্যবহার করে)।

চ. RAM ও ROM-এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন। ২.৫

উত্তর : কম্পিউটার সিস্টেমে RAM (Random Access Memory) এবং ROM (Read-Only Memory) হলো দুই ধরনের প্রাথমিক বা প্রাইমারি মেমরি। কার্যপ্রণালী এবং ডেটা সংরক্ষণের পদ্ধতির ভিত্তিতে এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	RAM (Random Access Memory)	ROM (Read-Only Memory)
সংরক্ষণের প্রকৃতি	**উদ্বায়ী (Volatile):** বিদ্যুৎ চলে গেলে ডেটা মুছে যায়।	**অনুদ্বায়ী (Non-Volatile):** বিদ্যুৎ চলে গেলেও ডেটা স্থায়ী থাকে।
কাজের উদ্দেশ্য	**কর্মক্ষম মেমরি:** সিপিইউ বর্তমানে যে ডেটা ও প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছে, তা সাময়িকভাবে ধরে রাখে।	**স্থায়ী মেমরি:** কম্পিউটার চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক নির্দেশাবলী (BIOS/UEFI) স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে।
ডেটা অ্যাক্সেস	ডেটা **পঠন (Read)** ও **লিখন (Write)** উভয়ই করা যায়।	ডেটা সাধারণত **শুধুমাত্র পঠন (Read)**-এর জন্য।
গতি (Speed)	**অনেক দ্রুত।**	**ধীর** (RAM-এর তুলনায়)।
ধারণ ক্ষমতা	সাধারণত **বেশি** (GB-তে মাপা হয়)।	সাধারণত **কম** (MB-তে মাপা হয়)।
উদাহরণ	DRAM, SRAM।	PROM, EPROM, Flash ROM।

ছ.

LAN কী? LAN-এর বিভিন্ন প্রকার টপোলজির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২.৫

উত্তর : LAN (লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক) হল একটি সীমিত ভৌগলিক এলাকার মধ্যে একাধিক কম্পিউটার এবং ডিভাইসকে সংযুক্ত করার একটি নেটওয়ার্ক। এর বিভিন্ন প্রকার টপোলজি রয়েছে, যার মধ্যে বাস, রিং, স্টার, মেশ, ট্রি এবং হাইব্রিড টপোলজি প্রধান। এগুলি হল সেই উপায় যেখানে কম্পিউটারগুলো একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে।

LAN টপোলজির প্রকারভেদ:

বাস টপোলজি: একটি একক তারের (ব্যাকবোন) মাধ্যমে সমস্ত কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে। ডেটা বাস বরাবর চলাচল করে এবং প্রতিটি ডিভাইস দেখে যে ডেটাটি তাদের জন্য কিনা।

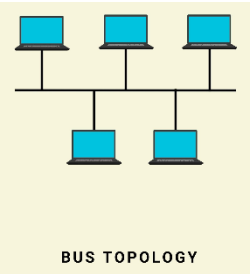

রিং টপোলজি: প্রতিটি কম্পিউটার তার পাশের দুটি কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং একটি বৃত্তাকার পথে ডেটা আদান-প্রদান করে।

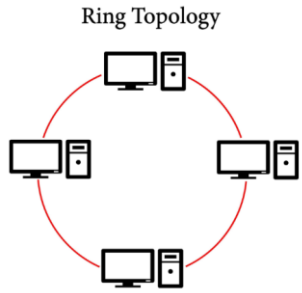

স্টার টপোলজি: একটি কেন্দ্রীয় হাব বা সুইচের সাথে প্রতিটি কম্পিউটার আলাদাভাবে সংযুক্ত থাকে। এটি বর্তমানে সবচেয়ে প্রচলিত টপোলজি।

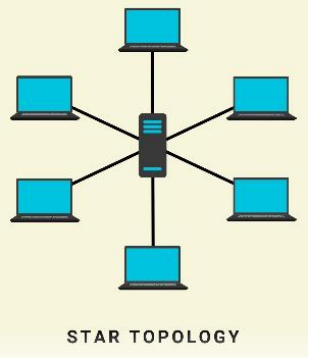

মেশ টপোলজি: প্রতিটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রতিটি বা বেশিরভাগ কম্পিউটারের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে। এটি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হলেও ব্যয়বহুল।

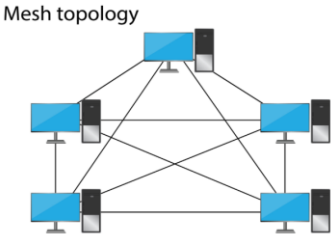

ট্রি টপোলজি: এটি একটি হায়ারার্কিক্যাল টপোলজি, যা বাস এবং স্টার টপোলজির সংমিশ্রণের মতো। এটি একটি স্টার নেটওয়ার্কের মতো, যার মধ্যে একাধিক স্টার নেটওয়ার্ক একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে।

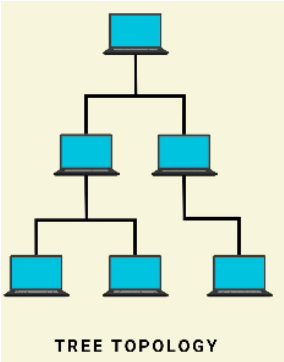

জ. UPS এবং IPS-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ২.৫

উত্তর : UPS এবং IPS হলো পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেম, যা বিদ্যুৎ চলে গেলে আপনার ডিভাইসগুলোকে চালু রাখতে সাহায্য করে। তাদের মূল পার্থক্য নির্ভর করে তাদের কার্যপ্রণালী এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায় তার ওপর।

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	UPS (Uninterruptible Power Supply)	IPS (Instant Power Supply) / Inverter
মূল উদ্দেশ্য	বিদ্যুৎ চলে গেলে **তাৎক্ষণিক** ব্যাকআপ দিয়ে সংবেদনশীল ডিভাইসকে (যেমন: কম্পিউটার) রক্ষা করা।	বিদ্যুৎ চলে গেলে **দীর্ঘ সময়ের** জন্য সাধারণ ডিভাইসকে (যেমন: ফ্যান, লাইট) চালু রাখা।
সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়	**০ মিলিসেকেন্ড (ms)**। কোনো বিরতি নেই, তাই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকে।	**৫-৫০০ মিলিসেকেন্ড বা তার বেশি**। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটি ছোট বিরতি থাকে।
আউটপুট ওয়েভফর্ম	সাধারণত **পিওর সাইন ওয়েভ** বা উন্নত মডিফাইড সাইন ওয়েভ।	সাধারণত **মডিফাইড সাইন ওয়েভ**।
ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ	বিল্ট-ইন **ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক (AVR)** থাকে।	সাধারণত কোনো ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক থাকে না।
উপযোগিতা	সার্ভার, কম্পিউটার, সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম।	ফ্যান, লাইট, টিভি (সাধারণ গৃহস্থালী ব্যবহার)।

ঝ. DBMS বলতে কী বোঝানো হয়? DBMS-শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করুন। ২.৫

উত্তর : DBMS হলো ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Database Management System)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি এমন একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন যা ব্যবহারকারী এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনকে একটি সুসংগঠিত তথ্যভান্ডার বা ডেটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ, আপডেট এবং কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

DBMS মূলত ডেটা সংগঠিত করার পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়:

১. রিলেশনাল ডিবিএমএস (RDBMS): * ডেটা টেবিল বা সারি-কলাম আকারে সংরক্ষণ করে। * বিভিন্ন টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক (Relation) স্থাপন করা যায়। * সর্বাধিক ব্যবহৃত মডেল। উদাহরণ: MySQL, Oracle, MS SQL Server.

২. হায়ারারকিক্যাল ডিবিএমএস (Hierarchical DBMS): * ডেটা একটি ট্রি (Tree) কাঠামোর মতো শ্রেণিবদ্ধভাবে সাজানো হয় (এক প্যারেন্ট, একাধিক চাইল্ড)। * সম্পর্কগুলো কঠোরভাবে একমুখী।

৩. নেটওয়ার্ক ডিবিএমএস (Network DBMS): * ডেটা একটি গ্রাফ (Graph) বা জালিকার মতো কাঠামোর মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত থাকে। * একটি চাইল্ড রেকর্ডের একাধিক প্যারেন্ট থাকতে পারে।

৪. অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড ডিবিএমএস (OODBMS): * ডেটাগুলোকে অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং-এর মতো অবজেক্ট হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।

৫. নো-এসকিউএল ডিবিএমএস (NoSQL DBMS): * বিশাল এবং অসংগঠিত ডেটা (Unstructured Data) পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। * এতে সম্পর্ক (Relation) তৈরির কঠোর নিয়ম নেই। উদাহরণ: MongoDB (ডকুমেন্ট ডেটাবেজ).

ঞ. Compiler ও Interpreter-এর পার্থক্যসমূহ লিখুন। ২.৫

উত্তর : কম্পাইলার (Compiler) এবং ইন্টারপ্রেটার (Interpreter) হলো দুটি ভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম যা উচ্চ-স্তরের (High-level) প্রোগ্রামিং ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য যন্ত্র-ভাষায় (Machine Code) রূপান্তর করে। তাদের কাজের পদ্ধতি ও গতির ওপর ভিত্তি করে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	কম্পাইলার (Compiler)	ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)
অনুবাদ পদ্ধতি	পুরো সোর্স কোড **একসাথে** অনুবাদ করে।	সোর্স কোডের **লাইন বাই লাইন** অনুবাদ করে।
ফাইল তৈরি	এক্সিকিউশনের জন্য একটি **অবজেক্ট কোড** তৈরি করে।	কোনো অবজেক্ট কোড তৈরি করে না।
নির্বাহের গতি	**দ্রুত** (একবার কম্পাইল হওয়ার পর)।	**ধীর** (প্রতিবার অনুবাদ করতে হয়)।
ত্রুটি প্রদর্শন	**সব ত্রুটি একসাথে** প্রদর্শন করে।	**ত্রুটি পাওয়ার সাথে সাথে** প্রদর্শন করে।
উদাহরণ	C, C++।	Python, PHP।

ট. উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে Data ও Information শব্দ দুটির সংজ্ঞা লিখুন। ২.৫

উত্তর : ডেটা হলো অসংগঠিত, অপরিশোধিত এবং বিচ্ছিন্ন উপাদান, যা প্রক্রিয়াকরণের (Processing) আগে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না।উদাহরণ: কোনো একটি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের তালিকা: 75, 80, Rahim, 92, Karim, 65, A'I (এখানে এই সংখ্যা বা নামগুলো কীসের সাথে সম্পর্কিত, তা স্পষ্ট নয়)।

ইনফরমেশন হলো প্রক্রিয়াকৃত, সংগঠিত এবং কাঠামোগত ডেটা যা প্রাপকের জন্য অর্থপূর্ণ এবং কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক।

উদাহরণ: প্রক্রিয়াকরণের পর প্রাপ্ত ফলাফল:

- রহিমের প্রাপ্ত নম্বর: 75
- করিমের প্রাপ্ত নম্বর: 65
- ক্লাসের গড় নম্বর: 78
- সর্বোচ্চ প্রাপ্ত গ্রেড: A

ঠ. WWW কী? URL-এর বিভিন্ন অংশগুলোর নাম উদাহরণ সহকারে লিখুন। ২.৫

উত্তর : **WWW** হলো **World Wide Web** (ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি ইন্টারনেটে উপলব্ধ সমস্ত **ওয়েবপেজ, ডকুমেন্ট এবং রিসোর্সের** একটি বিশাল সংগ্রহ, যা পরস্পরের সাথে হাইপারলিঙ্ক দ্বারা সংযুক্ত এবং HTTP প্রোটোকলের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা হয়। এটি ইন্টারনেট ব্যবহার করার প্রধান মাধ্যম।

URL (Uniform Resource Locator) হলো ইন্টারনেটে একটি নির্দিষ্ট রিসোর্সের ঠিকানা। একটি সাধারণ URL-এর প্রধান অংশগুলো নিচে একটি উদাহরণের সাহায্যে দেওয়া হলো:

উদাহরণ:

https://www.example.com/folder/file.html

অংশের নাম	উদাহরণে অংশ	কাজ
১. প্রোটোকল (Protocol)	`https`	সার্ভারের সাথে যোগাযোগের নিয়ম (যেমন: ডেটা কীভাবে আদান-প্রদান হবে) নির্দেশ করে।
২. ডোমেইন নেম (Domain Name)	`www.example.com`	সার্ভারের নাম বা ওয়েবসাইটের ঠিকানা। এটি আইপি অ্যাড্রেসের একটি সহজে পাঠযোগ্য রূপ।
৩. পাথ (Path)	`/folder/file.html`	সার্ভারের মধ্যে নির্দিষ্ট ফাইল বা পেজটির অবস্থান নির্দেশ করে।

ড. Computer network-এ router-এর কাজ কী? রাউটারের অপারেশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকুন। ২.৫

উত্তর : কম্পিউটার নেটওয়ার্কে **রাউটার (Router)** হলো এমন একটি ডিভাইস যা বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে ডেটা প্যাকেট বা তথ্য আদান-প্রদান করতে সাহায্য করে।

রাউটারের প্রধান কাজ হলো:

1. **প্যাকেট ফরওয়ার্ডিং (Packet Forwarding):** এটি ডেটা প্যাকেটগুলো গ্রহণ করে, গন্তব্য আইপি অ্যাড্রেস (Destination IP Address) দেখে এবং তার অভ্যন্তরীণ **রাউটিং টেবিল (Routing Table)** ব্যবহার করে প্যাকেটটিকে পরবর্তী নেটওয়ার্কে বা সঠিক গন্তব্যে পাঠিয়ে দেয়।

2. **নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন:** এটি দুটি ভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ককে (যেমন: লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট) সংযুক্ত করে।
3. **সর্বোত্তম পথ নির্বাচন (Best Path Selection):** একাধিক সম্ভাব্য পথের মধ্যে থেকে ডেটা স্থানান্তরের জন্য সবচেয়ে কার্যকর বা দ্রুততম পথটি নির্বাচন করে।

রাউটারের অপারেশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম :

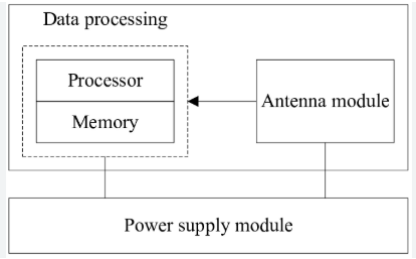

ঢ. Blue Tooth কী? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ২.৫

উত্তর : ব্লুটুথ (**Bluetooth**) হলো একটি স্বল্প-পাল্লার (Short-range), তারবিহীন (Wireless) যোগাযোগ প্রযুক্তি যা দুটি বা তার বেশি ডিভাইসকে (যেমন: মোবাইল ফোন, হেডফোন, স্পিকার, কম্পিউটার ইত্যাদি) ডেটা আদান-প্রদান করতে বা একে অপরের সাথে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে।

ব্লুটুথ-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

- **পূর্ণরূপ:** এর কোনো প্রমিত পূর্ণরূপ নেই। এটি মূলত দশম শতাব্দীর ডেনমার্কের রাজা **হারাল্ড ব্লুটুথ (Harald Bluetooth Gormsson)**-এর নাম থেকে অনুপ্রাণিত।
- **কার্যপ্রণালী:** এটি **রেডিও তরঙ্গ (Radio Waves)** ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপন করে, সাধারণত 2.4 GHz আই.এস.এম. (ISM) ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ব্যবহার করে।
- **উদ্দেশ্য:** ব্লুটুথের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তারের ব্যবহার কমিয়ে ডিভাইসের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানকে সহজ করা, যা **প্যান (Personal Area Network)** নামেও পরিচিত।
- **পাল্লা:** এর পাল্লা খুবই সীমিত, সাধারণত ১০ মিটার (ক্লাস ২ ডিভাইস) থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত (ক্লাস ১ ডিভাইস)।
- **ব্যবহার:** ওয়্যারলেস হেডফোন ও স্পিকার, স্মার্টওয়াচ, ওয়্যারলেস কীবোর্ড ও মাউস এবং ফাইল শেয়ারিং-এর ক্ষেত্রে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- **সুবিধা:** এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে, কম শক্তি খরচ করে এবং সেটআপ করা তুলনামূলকভাবে সহজ।